প্রতিধ্বনি the Echo
An Online Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India.
Website: www.thecho.in

বহুস্বরিক উপন্যাস — ‘অরণ্য-বহ্নি’

(Bohuswarik Uponyas: 'Aranya-banni')

Dr. Prabhakar Mandal
Asst. Prof., Dept. of Bengali, Naharkatiya College, Naharkatia, Dibrugarh

Abstract

‘Aranya Banhi’ a famous novel of Tara Sankar Bandopadhaya was published in the year 1966. The novelist established his linguistic architect of art which is completely new and exceptional in nature in the field of literature. The main objective of the novel is a psychological effect of the lower class of people in the society who were being oppressed by the comparatively higher Section of people and the British Administrator. At the same time it reflected the atmosphere of opposion and helplessness of this class. In the context of novel Nayan Pal a spokesperson sometimes interacted with the novelist, history and himself. But the members of the revolutionary party of Sauntals. Interacted themselves in a different manner. Thus the novel Aranya Banhi is became a polipheric novel (Bahuswar).Tarasanker Bandapadhyaya was always against colonialism. The novel itself represented the opinion and ideas of the downtrodden community. The main theame of Aranya Banhi is the activity of revolutionary association and their necessary rules and regulations of Sauntals. If we go through the novel we came to know the life style, Behavior and culture of the Sauntal community of that period. The novelist who was aware of historical background of this people wanted to focus the motto of mutiny of the Sauntalis. At the same time he tried to describe the exclaimatory environment associated with Japanese people of 1645 and Sauntals of 1854. At the end we can conclude that the novel is the mirror of the Sauntalis who are still fighting for their freedom.

শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় আয়োজিত নলহাটির সাহিত্য সভায় অতুল গুপ্ত সেই সভার সভাপতি তারাশঙ্করের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন — ‘বঙ্গ সরস্বতীর খাস তালুকের মণ্ডল প্রজা’। এই উক্তি যথার্থ। কেননা শরৎচন্দ্র পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি আমাদের অস্থির, সংশয়-বিক্ষুব্ধ-অবিশ্বাসী যুগের প্রধান কথাশিল্পী। রবীন্দ্রোত্তর পর্বে তারাশঙ্কর একজন যথার্থ শিল্পী। অর্ধশতাব্দী কালসীমায় কথাসাহিত্যের সমস্ত তরঙ্গ বিক্ষোভ তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসকে স্পর্শ করেছে কিন্তু সমকালীনতার গণ্ডী অতিক্রম করে লেখক হয়ে উঠেছেন সর্বকালের। তারাশঙ্কর মনে করতেন — মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। এই ঘোষণা তার উপন্যাস, ছোটগল্পে রক্ত-মাংস-মজ্জা, তাঁর মন-প্রাণ-আত্মা, তাঁর শিল্পের দলিল। এককথায় সুস্থ জীবনের মৌরসীপাট্টা। রাঢ় বাংলার চলমান জীবনের বিশ্বস্ত রূপকার তারাশঙ্কর তাই কালান্তরের কথাকার। যৌবনে তারাশঙ্কর প্রভাবিত হলেন বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা। তাই জমিদারী

অত্যাচার, জাতিগত, ভেদাভেদ-এর প্রতি তিনি সোচ্চার হলেন।

তারাশঙ্করের আগে বাংলা সাহিত্যের তিন জ্যোতিষ্ক —বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। এই তিন ব্যক্তিত্বই তারাশঙ্করের মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছেন। তাই তারাশঙ্কর পূর্ব-সাহিত্যের ও পূর্বসূরি সাহিত্যিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কল্লোল পর্বের তরুণ লেখকদের রচনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংশয় ও অস্থিরতা, চাঞ্চল্য ও নাগরিক মনোভাব, নেতিবাদী ও নাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি থেকে এক নিবিড় জীবন প্রত্যয়ে সরে এসেছিলেন তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ। তারাশঙ্কর তাঁর জীবনে দেখেছেন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, অহিংস আন্দোলন, সাম্যবাদী আন্দোলন, আইন-অমান্য আন্দোলন, ৪২—এর সংগ্রাম, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও দেশবিভাগ, পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন এবং পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের অভ্যুদয়। সেই সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মন্বন্তর, উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং নীতিবোধের পশ্চাদপসরণ। তারাশঙ্করের মানসিকতা এই পটভূমিতে গড়ে উঠেছিল।

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার আসার একবছর আগে। নকশাল আন্দোলন তো তারও পরের ঘটনা। সুতরাং 'অরণ্য-বহ্নি' সাতের দশকের প্রবল রাজনৈতিক উত্থানপতনের প্রভাবে লেখা হয়েছিল — এমন কথা কোনো অবস্থাতেই বলা চলে না। এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর শিল্পরূপের যে স্থাপত্য নির্মাণ করেন তা তার আগের উপন্যাসগুলির তুলনায় অনেক স্বতন্ত্র ও অভিনব। তারাশঙ্করের বাল্যকালেও বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা একই প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। সাঁওতাল পরগণা ছিল বীরভূম জেলার অংশ। তিনি সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনি শুনেছিলেন তাঁর বিধবা পিসিমার কাছে। পিসিমা শুনেছিলেন তাঁর দিদিমার কাছে। মৌখিক ইতিহাস বা ওরাল হিস্ট্রির পাশাপাশি তিনি লিখিত উপাদান হিসেবে ডিস্ট্রিক গেজেটিয়র, হ্যান্ডবুক, ও হাণ্টার সাহেবের বইকেও ব্যবহার করেছিলেন। শিবরতন মিত্রের সংগ্রহশালায় সাঁওতাল বিদ্রোহের ছড়া বা পাঁচালী পড়েছিলেন তারাশঙ্কর। মামুদবাজার থানার কুলকুড়ি গ্রামের কায়স্থসন্তান রাইকৃষ্ণ দাশ সেই পাঁচালী লিখেছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকর' থেকেও তারাশঙ্কর সংগ্রহ করেছেন কিছু কিছু তথ্য।

এই উপন্যাসের নির্মাণকৌশলটি অভিনব। উপন্যাসের শুরুতেই প্রায় ১৪/১৫ পৃষ্ঠার একটি প্রস্তাবনা অংশে তিনি পাঠককে জানিয়ে দেন — কেমনভাবে তিনি এই উপন্যাস লেখার অনুপ্রেরণা পেলেন ও কেমনভাবে তিনি এই উপন্যাসের একটি চরিত্র নয়ন পালের কাছে পোঁছালেন। মৌখিক ইতিহাস বা ওরাল হিস্ট্রির গবেষকরা যেভাবে পায়ে হাঁটে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের মুখ থেকে শুনে শুনে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেন — তারাশঙ্করও সেইভাবে ময়ুরাক্ষীর উত্তর দিক থেকে শুরু ক'রে ওদিকে দুমকা, এদিকে পাকুড়-সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে পঁচাশি বছরের বৃদ্ধা ধ্বজু মল্লিকের কাছ থেকে হিরণপুরের ঘাটের কাছে রামচন্দ্রপুরে হরিশ ভট্টাচার্যের পরিবারের সন্ধান পান। হরিশ ভট্টাচার্যর পিতামহের দাদা ছিলেন ত্রিভুবন ভট্টাচার্য। সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়ে তাঁকে সিধু কানুর দল নিয়ে গিয়েছিল দুর্গাপূজা করাবার জন্য। ভট্টাচার্য পরিবারের কাছে তিনি চরণপুরের নয়ন পালের সন্ধান পান। নয়ন পালের পিতামহের হাতে নির্মিত হয়েছিল সাঁওতালদের দুর্গাপূজার প্রতিমা। ঐ প্রতিমাকেই পূজা করেছিলেন ত্রিভুবন ভট্টাচার্য। নয়ন পালের বাড়িতে ছিল অনেক পুরানো পট। ঐসব পটে আঁকা ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহের বিবরণ। নয়ন পালের জ্যাঠামশাই নফর পাল সাঁওতাল বিদ্রোহের অংশগ্রহণ ক'রে সাত বছর জেল খেটেছিলেন। সেই প্রাচীন পটগুলি দেখিয়ে নয়ন পাল সাঁওতাল বিদ্রোহের বিবরণ দিতে থাকে গোটা উপন্যাস জুড়ে। গোটা উপন্যাসের বয়ন ও বুনন আমাদের চৈতন্যে স্পষ্ট ক'রে তোলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও

দেশীয় উচ্চবর্গের মানুষদের অত্যাচার আক্রমণ ও হিংস্রতার মনস্তত্ত্বকে। এবং তার পাশাপাশি নিম্নবর্গের মানুষদের অসহায়তা ক্রন্দন ও প্রতিরোধের পরিমণ্ডলকেও। উপন্যাসের কাঠামোতে কথক নয়ন পাল কখনও কথা বলে ঔপন্যাসিকের সঙ্গো, কথনও ইতিহাসের সঙ্গো, আবার নিজের সঙ্গোও। পাশাপাশি ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর নায়ক-নায়িকার যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলেন তখন আবার ভিন্নতর কণ্ঠস্বরকে উপন্যাসের শরীর ধারণ করে। এইভাবেই তারাশঙ্করের 'অরণ্য-বহ্নি' হয়ে ওঠে একটি পলিফোনিক বা বহুস্বরিক উপন্যাস। তারাশঙ্করের নির্মাণকৌশলের অভিনবত্বের কারণেই প্রতিটি কণ্ঠস্বরের স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়।

এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর ঔপনিবেশিকতাকে প্রত্যাখ্যানের মতাদর্শগত বিশ্বাসে স্থিত থাকেন। শিল্পের নিজস্ব নিয়মকে অনুসরণ করতে করতে, সামাজিক সন্দর্ভের পাশাপাশি একটি সাহিত্যিক সন্দর্ভ নির্মাণ করতে করতে, শিল্পের স্বায়ত্তশাসিত বাস্তবে দাঁড়িয়ে তারাশঙ্কর ১৯৬৬-তেও আবার একটি প্রতিবাদী পরিসর নির্মাণ ক'রে তোলেন। আর তা করতে গিয়ে তাঁকে উপন্যাস নামক শিল্পমাধ্যমটির অভ্যন্তরে ঐতিহাসিক তথ্য ও অভিজ্ঞতা, নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, আঞ্চলিক ভাষা, নিম্নবর্গের মনস্তত্ত্ব, কথকতা-পাঁচালী, রিপোর্টাজ, সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার প্রাপ্তিসমূহ ইত্যাদি অনেক উপাদানকে সমন্বিত ক'রে তুলতে হয়। এই উপন্যাসে তারাশঙ্করের ভাষাগত বয়ন ও বুনন — সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গো এবং সংযোগের মৌলিক ভূমিকার সঙ্গো অবিচ্ছিন্ন থাকে। তার ফলে নিম্নবর্গের ভাষা, আকাঙ্খা, ও মনস্তত্ত্ব এই উপন্যাসের শরীরে মূর্ত হয়ে থাকে। নিম্নবর্গের সামাজিক ও মতাদর্শগত কণ্ঠস্বরের প্রতিনিধিত্ব করে 'অরণ্য-বহ্নি'।

তারাশঙ্কর 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাস রচনার সময়ে ইতিহাসের লিখিত উপাদানের ওপর নির্ভর করলেও প্রধানত মৌখিক ইতিহাস বা ওরাল হিস্ট্রির ওপরেই নির্ভর করেছিলেন। নয়ন পাল পট দেখিয়ে ইতিহাস বর্ণনা করবার সময়ে, একই চিন্তা বারবার স্মরণ করার সুবিধার্থে, ছন্দ-সূত্র-প্যাটার্ণ-নির্ভর হয়ে ওঠে। 'অরণ্য-বহ্নি'তে দিকু/হিন্দু/উচ্চবর্গের সঙ্গো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বোঝাপড়ার দিকটি তুলে ধরার সঙ্গো সঙ্গো সাঁওতাল/নিম্নবর্গের সঙ্গো তাদের বিরোধিতার কারণ-প্রেক্ষাপটকেও উন্মোচিত করা হয়েছে। শাসকশ্রেণীর চেতনার বিপরীত বিন্দুতে দাঁড়িয়ে নিম্নবর্গের চেতনা কীভাবে তার স্বায়ত্তকে বাঁচিয়ে রাখে তাও দেখানো হয়েছে। এই স্বায়ত্তের কারণেই যে বিরুদ্ধতার জন্ম হয় তার বাস্তব প্রকাশ ইতিহাসে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। সাঁওতাল লোকমানসে কিছু কিছু দেশজ উপাদান আশ্চর্য রকমের শক্তি নিয়ে বেঁচে থাকে। ঔপনিবেশিক শক্তির নানা ধরণের আক্রমণ এইসব দেশজ উপাদানকে, তৃতীয় দুনিয়ার প্রকৃতির মতোই, ধ্বংস করতে পারে না। তাদের যৌথ চৈতন্যের গভীরে এমন এক স্বাভাবিক নীতিবোধ অকম্পিত থাকে — যা প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম, ঔপনিবেশিক ন্যায়শাস্ত্র, বা আইনের তুলনায় অত্যন্ত সহজ ও সরল অথচ গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে নানা ধরণের পরিবর্তন ঘটলেও তাদের এই স্বাভাবিক ন্যায়-অন্যায় বোধ অক্ষুণ্ণ থাকে। এমন—কি ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে নানা ধরণের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের সৃজনশীল ও অভিনব প্রতিরোধ-পন্থার জন্ম হয় এই ন্যায়-অন্যায় বোধের সূত্রেই।

আপাতদৃষ্টিতে সিধু-কানুর সাঁওতাল বিদ্রোহকে আকস্মিক মনে হ'লেও, কিছু অবাস্তব পৌরাণিক কল্পনা দ্বারা চালিত ব'লে মনে হ'লেও — প্রচলিত অর্থে তা কিন্তু আদৌ স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। তার পিছনে ছিল প্রস্তুতি সাঁওতালচৈতন্যের স্বাতন্ত্র্যে ও অভিনবত্বে। 'অরণ্য-বহ্নি'র প্রধান অংশ জুড়ে বিবৃত করা হয়েছে সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রস্তুতি ও সংগঠন বিষয়ক পদক্ষেপগুলি। আর এই বর্ণনার মধ্যেই ধরা

আছে সাঁওতালদের তখনকার আচার-আচরণ ও ভাবাদর্শ। সাঁওতাল বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও রাজনীতির সীমানাকে অস্বীকার ক'রে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা-বিন্যাস সম্পর্কেও বেশ কিছু মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। ঔপনিবেশিক ক্ষমতা-বিন্যাসকে কোনোভাবেই অবলম্বন না ক'রে নিজেদের স্বাধীনতা ও মুক্তির কথা তারা ভেবেছিল। পল্টন সাহেবকে প্রত্যাখ্যানের সূত্রেই এই ভাবনা স্পষ্ট হয়। আবার সিধু, বিশু ও কানুর নিম্নলিখিত কথোপকথনের সূত্রেও ঔপনিবেশিক ক্ষমতা-বিন্যাসের সম্পূর্ণ বাইরে দাঁড়িয়ে ঔপনিবেশিকতাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যানের আবেগে কম্পমান কণ্ঠস্বরই উচ্চকিত হয়ে ওঠে।

নিম্নবর্গের নিজস্ব রাজনৈতিক চেতনা নির্মিত হয়ে উঠেছিল অধীনতার অভিজ্ঞতা থেকে। দৈনন্দিন দাসত্ব শোষণ আর বঞ্চনার মধ্যেও স্বঅস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই-এর মাধ্যমে। বিদ্রোহের আগে স্বাভাবিক অবস্থায় সাহেব ও দিকুরা নিম্নবর্গের সাঁওতালদের অনুগত প্রজা হিসেবেই ভাবতে অভ্যস্ত ছিল। একমাত্র বিদ্রোহের মুহূর্তেই সাঁওতাল ও নিম্নবর্গের যে নিজস্ব চেতনা আছে, নিজস্ব স্বার্থ আছে, উদ্দেশ্য আছে, কর্মপদ্ধতি আছে, সংগঠন আছে — তা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু তা থেকে আবার এই সিদ্ধান্তেও পৌঁছানো যাবে না যে, সাঁওতাল বিদ্রোহের কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল না। সিধু ও কানু বোঙ্গাবাবার নির্দেশে বিদ্রোহের নেতৃত্ব হাতে তুলে নিয়েছিল। সাঁওতাল সমাজও একথা বিশ্বাস ক'রে তাদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছি। নিম্নবর্গের চেতনায় উপস্থিত এই ধর্মবিশ্বাস, অলৌকিকতা, মিথ, দৈবশক্তিতে আস্থা, অলীক কল্পনা ইত্যাদিকে যুক্তিবাদী ও দীপায়নের সামান্যতম প্রভাব ছাড়াই বেঁচেবর্তে ছিল, জীবনযাপন করছিল — তাদের চেতনার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে তন্নিষ্ঠভাবে বুঝতে চাইলে ধর্ম, মিথ, অলৌকিকতা ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। জবরদস্তি সে চেষ্টা করলে নিম্নবর্গের নিজস্ব রাজনীতিকে উচ্চবর্গের ছকে ফেলে মতাদর্শগত আধিপত্যের সীমানার মধ্যে বন্দী ক'রে ফেলা হয়। তাহলে ইতিহাসে নিম্নবর্গের কীর্তির স্বাক্ষর হারিয়ে যায়। তাদের মহান ঐতিহাসিক কীর্তি শাসকশ্রেণীর মতাদর্শগত আধিপত্যের পরিসীমার মধ্যে আত্তীকৃত হয়ে যায়।

তাদের সীমাবদ্ধতার কথাও বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর চমৎকার বলেন, "ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জ্ঞান। পূজক তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব, পুরোহিত তার কূটবুদ্ধি। সেখানে আজও ন্যায় নেই, পাপ নেই, অন্যায় নেই।" সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কৌশলে বিভ্রান্ত হয়ে সাঁওতালরা যখন পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসে ও বন্দুকের গুলিতে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করে — তখন তারা অপার বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছি। "বোঙ্গারা মরছে, গুলি দেখা যাচ্ছে না, প'ড়ে হাত-পা খিঁচে ম'রে যাচ্ছে, দেখে হাঁ গেল কানু।" এরপরেই তারাশঙ্করের মনে পড়ে হিরোশিমার কথা। "সেদিন আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অগ্রসর জাপানী জাত এমনিভাবে অবাক হয়ে গিয়েছিল।" তারাশঙ্কর তার নিজস্ব ইতিহাসবোধের ওপর দাঁড়িয়ে, ঔপনিবেশিকতাকে প্রত্যাখ্যানের সূত্রে, ১৮৫৪-তে সাঁওতালদের বিস্ময়ে আর ১৯৪৫-এ জাপানীদের অবাক হওয়াকে শিল্পসম্মতভাবেই অন্বিত ক'রে তোলেন।

দ্বিবাচনিকতার মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিকের সাহিত্যিক-ভাষা ও নিম্নবর্গের কথ্যভাষার বিরোধের প্রাচীর ভেঙে যায়-প্রকৃতি সমাজ ও ব্যক্তিমানুষের পারস্পরিক সম্পর্কসমূহের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতা এক নান্দনিক নির্মাণ-প্রক্রিয়ার ভিতরে অন্বিত হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে একথাও স্মর্তব্য যে, এই অন্বয়-প্রক্রিয়ার মধ্যে সামাজিক স্তরসমূহ, সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ, ও পেশাগত জার্গানসমূহের সঙ্গে সঙ্গাতি রেখেই উপন্যাসটির স্থাপত্য ও ভাষাসমূহের অভ্যন্তরীণ স্তর নির্মিত হয়ে ওঠে। এইভাবে 'অরণ্য-বহ্নি' একটি বিদ্রোহের যুগের ভাষার বহুরূপতাকে ও সেই যুগের বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক ও মতাদর্শগত কণ্ঠস্বরের

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ধারণ করে। সেই কারণেই, 'অরণ্য-বহ্নি' বিভিন্ন বিরোধিতার পূর্ণ কণ্ঠস্বরকে ও তাদের আশা-আকাঙ্খার সংঘাতকে স্পষ্ট ক'রে তোলে। চৈতন্য-বিন্দুগুলির বহুত্ব ও কণ্ঠস্বরের বহুত্ব এই উপন্যাসের বয়ানে স্পষ্ট। আবার তার পাশাপাশি নায়ক সিধুর চরিত্র ও কণ্ঠস্বর একজন ব্যক্তিমানুষের চেতনার পরিধির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। এই উপন্যাসের নায়ক শেষপর্যন্ত স্বাধীন, অশেষ ও অনির্ধারিত থেকে যাবার কারণেই উপন্যাসটিও হয়ে ওঠে ওপেন-এণ্ডেড। 'অরণ্য-বহ্নি' আমাদের জানিয়ে দেয় যে সমস্ত ইউরোকেন্দ্রিক ভাবনা-জগতের বাইরে যে আবহমান ভারতীয় সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজ ঔপনিবেশিকতার সমস্ত আক্রমণকে প্রত্যাখ্যান ক'রে আপন জগতে স্থিত থেকেছে-সেই জগৎও অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়, গ্লানিকর নয়, একমাত্রিক নয়। ঔপনিবেশিকতার প্রভাবমুক্ত ভারতীয় জনসমাজের বহুমাত্রিক অনুপুঙ্খের সঙ্গে তারাশঙ্করের নিবিড় পরিচয় ছিল ব'লে এ তার জ্ঞান ও অনুভূতি অনন্যসম্পৃক্ত হয়ে থাকে এই উপন্যাসে। আবার সমাজ ও ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কিত গভীর জিজ্ঞাসার সূত্রে জ্ঞানতাত্ত্বিক সন্ধান আর শিল্পগত টেক্‌নিক অবিচ্ছিন্ন থাকে।

উপন্যাসের একেবারে শেষ পারাগ্রাফে তারাশঙ্কর লেখেন, "......সিধু আজও মুক্তি পায়নি, ইতিহাস ওকে মুক্তি দেয়নি। আজও সে বুকে হাত দিয়ে ছায়ায় মিশে সেই ফাঁসি যাওয়া মহুয়া গাছটায় ঠেস দিয়ে ভাবে।" ইতিহাস যে এখনও নিম্নবর্গকে মুক্তি দেয়নি — ১৯৬৬ তেও তারাশঙ্করের এই ভাবনা অতীত মুহূর্তের পায়ের ছাপের সঙ্গে অন্বিত ক'রে তোলে বর্তমানের বন্দীত্ব আর আগামী সম্ভাবনার ইশারাকে। এভাবেও এই উপন্যাসের বয়নে এসে যায় দ্বিবাচনিক আবহ। অতীতের অপরতার দর্পণে আমরা বুঝে নিই বর্তমান অস্তিত্ব আর ভবিষৎ সম্ভাবনাকে। এই উপন্যাসে সিধুর কণ্ঠস্বর এক যৌথ আকাঙ্খা-চাহিদার কথা উচ্চারণ করে। তাই ঔপন্যাসিকের কল্পনাদৃষ্টিতে ভর ক'রে পাঠকও যখন মহুয়াগাছে ঠেস দিয়ে ভাবুক স্বপ্নময় সিধুকে দ্যাখে, উপন্যাসের অন্তর্বয়ন তাকে নিয়ে যায় পরিধি থেকে কেন্দ্রের দিকে, বহির্বৃত থেকে অন্তর্বৃত অবস্থানের দিকে। বয়ন ও বুননের বহুকৌণিকতা ও বৈচিত্র্য পাঠকের চৈতন্যে আনে এক ঘনত্বের বোধ, এক সাবলাইম অনুভূতি। এই বোধ-অনুভূতিপুঞ্জের কোনো স্থির অবয়ব না থাকলেও তা একান্তভাবে মানবিক ব'লেই নির্মাণ ক'রে তুলতে পারে এক প্রতিবাদী পরিসর।

অরণ্যের নিম্ন শ্রেণীর কুশিলবদের নিয়ে বাংলা সাহিত্য আজ ভরপুর। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জনের সাহিত্য সৃষ্টি তুলে ধরেছি। তারমধ্যে অন্যতম বীজন ভট্টাচার্যের নাটক 'দেবীগর্জন' ১৯৬৬ তে লিখিত হলেও গ্রন্থাকারে তা প্রকাশিত হয় ১৯৬৯এ। কাহিনির মূলে রয়েছে 'কৃষক আন্দোলনের পটভূমি'। গ্রামের কৃষক নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এই নাটকে সংঘটিত হয়েছে। ঊষর লাল মাটির দেশ বীরভূমের পটভূমিতে আদিবাসী ও সাঁওতাল চাষীদের কৃষক আন্দোলনের ভিত্তিতে এই নাটকটির নামকরণ। এই নাটকে প্রভঞ্জন বেনামীতে সমস্ত জমি নিজের দখলে নিয়ে এসে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার সুখকে পিছনে রেখে সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছে। শোষিত কৃষকেরা বঞ্চিত ও শোষিত হতে হতে শুধু ঘর ছেড়ে চলে যায় নি, তারা ঘরে ফিরে এসে আবার নিজ নিজ অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। দারিদ্র্য ও দুর্দিনের মোকাবিলায় গঠিত হয়েছে ধর্মগোলা। শেষ দৃশ্যে তাই মংলার হাতের উদ্যত টাঙ্গি গিয়ে পড়ে প্রভঞ্জনের মাথার উপর ও প্রভঞ্জনের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি পায় সাধারণ মানুষ। রত্নার মৃত্যু ট্রাজিক রসকে ঘনীভূত করেছে। অরণ্যের অধিকার (১৯৭৭) উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী ১৮৯৭ এবং ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ কালীন মুণ্ডাবিদ্রোহের প্রস্তুতি, পট, বিস্তার, সীমাবদ্ধতা, মুণ্ডাদের স্বপ্ন দেখা এবং ব্যর্থতার কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন। কেন্দ্রীয় চরিত্র বিরসা। ১৮৯৭-তে তার মুক্তিতে মুণ্ডাদের

আনন্দ উল্লাস, মুণ্ডাদের ওপর দীর্ঘকালীন শোষণ, মুণ্ডা সর্দার হয়ে ভগবান রূপে আত্মঘোষণা, তার প্রেমজীবন, তার কর্মধারা, বিরসার গ্রেপ্তার, বিদ্রোহের ধূমায়িত বহ্নি, বিরসার গ্রেপ্তার নিয়ে প্রশাসনের টানাটানি, বিরসা ভক্তদের ভাবোদ্বেল কর্মপ্রয়াস, রাঁচী, সিংভূম, ছোটনাগপুরে আন্দোলন, বিরসার পলাতক জীবন, পীড়নে দুর্দশাগ্রস্ত সমাজের কথা জানতে পারা, বিরসার মৃত্যু ও বিনাশহীন লড়াই — এ সবকিছুই এই দীর্ঘ উপন্যাসে বর্ণিত। বিরসার আন্দোলনের প্রথম পর্যায় ধর্মাশ্রিত, যদিও মিশনারিদের ধর্মাশ্রিত শিক্ষাই বিরসাকে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে প্রবুদ্ধ করে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার লড়াই ১৮৯৫-১৯০০ সালে। উপন্যাসের এক জায়গায় তার চিৎকার — 'অরণ্যের অধিকার কৃষ্ণ ভারতের আদি অধিকার' আর লেখিকা বলেন, সব কালো মানুষ যেন তাকে দিয়ে কথাটা বলিয়ে নেয়।

তারাশঙ্করের দেশ-কাল-চেতনাটি ছিল ঐকান্তিক — তাঁর জীবনবোধ এবং জীবনবিন্যাসে তাই মহাকাব্যের ব্যাপ্তি এবং অমোঘতা। বীরভূম জেলার ব্রাহ্মণ জমিদার চালিত গ্রামে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারে জন্মে গ্রামজোড়া, তথা পারিপার্শ্বগত দরিদ্র-অশিক্ষিত আদিবাসী মানুষের জীবনের সঙ্গে খুঁজে পেয়েছিলেন অন্তরের যোগ। আর একদিকে প্রত্যক্ষ করছিলেন, জমিদারি আভিজাত্যের সামাজিক বনিয়াদ ভেঙে গিয়ে চারপাশে গড়ে উঠেছিল অর্থগৃধ্নু আত্মসর্বস্ব ধনতান্ত্রিক জীবন-ব্যবস্থা-সমাজ ভেঙেই যার জন্ম। সেই সঙ্গে শিল্পী আকৃষ্ট হয়েছিলেন গান্ধীপন্থী আন্দোলনে। সমাজে আর্থ-রাজনৈতিক বিপত্তির ঐতিহাসিক তরঙ্গটির সঙ্গেও যোগ তাঁর ছিল আন্তরিক। প্রধানত গ্রাম্যজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অমেয় পুঁজির সংযোগে গল্প-উপন্যাসের থীম গড়েছেন তারাশঙ্কর। তার সঙ্গে কালের ওঠাপড়াকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে নিয়ে জীবনের একটা পরিব্যাপ্ত সামগ্রিক রূপ গড়ে তুলতে চেয়েছেন উপন্যাসে।

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত বলেছেন, তাঁর সাহিত্যের দুই প্রধান উপজীব্য — মাটি আর মানুষ। মাটির মমত্ব আর মানুষের মহিমা। একথা যথার্থ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের অস্থির সংশয়, বিক্ষুব্ধ অবিশ্বাসী যুগের প্রধান কথাশিল্পী। তিনি যে সময়ের শিল্পী সে সময় পুরানো বিশ্বাস ও মূল্যবোধের অবসানের সময়। এই অর্ধশতাব্দীর সমস্ত তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ অবসান ঘটছিল, উদ্ভব হচ্ছিল নতুন বিশ্বাস ও মূল্যবোধের। তাঁর উপন্যাসেই মানবচরিত্র ও প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গী যোগ ঘটেছে। ভৌগোলিক সত্তা এখানে পটভূমি নয়, স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে দেখা দিয়েছে। চারপাশের ভূ-প্রকৃতি, বিচিত্র জনজীবন এবং তার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল জীবন্ত প্রত্যক্ষরূপে তাঁর সাহিত্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। ফলে তিনি হয়েছেন আঞ্চলিক জীবনের অন্তরঙ্গ রূপনির্মাতা।

তিনি তাঁর সাহিত্য সাধনায় খুঁজেছেন এক সমগ্র অখণ্ড মানুষকে, মানুষ ও প্রকৃতিকে, মাটির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে। বর্তমান সমাজে ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে ছিন্নমূল জীবনের বিচ্যুত এক ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের চিন্তা ও ভাবনা তথা আস্তিক্যবোধ মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে — একথা ভেবে দেখবার অবকাশ বোধ হয় এসেছে। বলাবাহুল্য তারাশঙ্করের শিল্পীমানস দেশ-কাল-সমাজের পটভূমিকায় বিচিত্র নরনারীর যে চিত্রশালা নির্মাণ করেছেন তা দেশকাল নিরপেক্ষ রূপলাভ করেছে, আর এখানেই কালান্তরের কথাকার তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠত্ব।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. ভারতীয় রাজনৈতিক উপন্যাসঃ প্রাক্-স্বাধীনতাপর্ব, শিশিরকুমার দাশ, অনুষ্টুপ, শারদীয় ১৯৮৬।

২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস, উত্তরপ্রসঙ্গ (১৯৮৬)।

৩. অশোক রুদ্র, বাংলা উপন্যাসে রাজনীতি, সমাজে নারী পুরুষ ও অন্যান্য প্রবন্ধ।

৪. কার্ত্তিক লাহিড়ী, রাজনীতি উপন্যাস সতীনাথ ভাদুড়ী, বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস, ১৯৭৮।

৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসঃ দ্বান্দ্বিক দর্পণ।

৬. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপন্ন সীমান্তঃ উদ্বিগ্ন সৈনিক, দেশ।

৭. ড. দেবেশ কুমার আচার্য, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা — ৯।

৮. ড. সত্যবতী গিরি, ড. সমরেশ মজুমদার, প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, রত্নাবলী, কলকাতা -৯।

৯. গৌতম চৌধুরি, উবুদশ, বর্ষ ১৫ সংখ্যা ১-৩, জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০০২।